Website: https://www.parthasarathipatrika.com

৩০ তম অন্তর্জাল সংখ্যা

৭ই আশ্বিন, ১৪২৯ / 24.09.2022

-: সম্পাদক :-

সুনন্দন ঘোষ

DO NOT COPY

-: সূচীপত্র :-

প্রীতি-কণা	শ্রী প্রীতিকুমার ঘোষ
স্মৃতিচারণ	শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ
একজন গৃহী যোগীর কাহিনী	ডঃ সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
বৈদান্তিক শ্রীশঙ্করাচার্য	শ্রী অমরেন্দ্র কুমার ঘোষ
বীরভক্ত তুলসীদাসের অলৌকিকত্ব	ব্রহ্মচারী অরূপচৈতন্য
ভক্ত বৎসল শ্রীরামকৃষ্ণ	শ্রী প্রণব ঘোষ
সেবাধর্মেই স্বর্গীয়সুখ প্রাপ্তি সম্ভব	শ্রীচিত্তরঞ্জন পাত্র
পিতা নো বোধি	শ্রী সুনন্দন ঘোষ

PARTHASARATHI: RNI 5158/ 60 for print format: converted to e-magazine by Publisher: Sunandan Ghosh during prolonged Nationwide Lockdown in 2020.

Website: https://www.parthasarathipatrika.com

Contact: 182 Jessore Road, Flat- D1, Kolkata- 700074. WhatsApp: 9433284720

DO NOT COPY

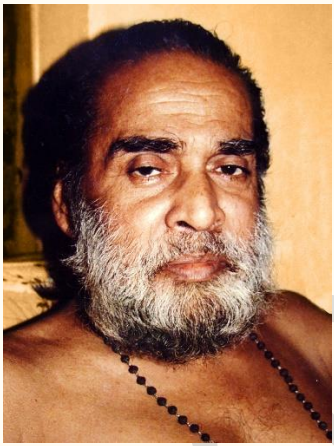

(10.03.1926 - 24.11.1986)

প্রীতি-কণা

"আমি আজ সমস্ত অতীতকে ভুলে যেতে চাইছি। শুধু ততটুকু থাক আমার সাথে যা ভবিষ্যত জীবনকে গড়বার পক্ষে সহায়তা করবে। সমস্ত অতীতই আমার জীবনে মধুময় ও প্রেমময়। এই অতীতই আজ আমাকে এখানে ও বর্তমান জীবনে পৌঁছে দিয়েছে। অতীত হয়তো কোথাও নিষ্ঠুর হয়েছে কিন্তু সে দিয়েছে শিক্ষা, জ্ঞান ও বিপুল অভিজ্ঞতার ঐশ্বর্য। যেখানে হৃদয়ের তিক্ততা পেয়েছি তারই মাঝে এসেছে শাশ্বত স্পন্দন। যেখানে কঠোর বেদনা ঠিক সেইখানেই পেয়েছি করুণাময়ীর অপার স্নেহ। সকলে হয়তো ছেড়েছে আমাকে, ছাড়েনি মা, ছাড়েনি রাধা। স্নেহ-মমতার শক্তি বল, প্রেম ভালবাসার গভীর বন্ধন, - সব কিছুই শাশ্বত।"

স্মৃতিচারণ **শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ**

দুর্গাপূজা চলে গেল আরেকবার (১৯৮৯)। শ্রীপ্রীতিকুমার প্রয়াত হবার পর এটি তৃতীয় দুর্গাপূজা। আগে তবু একদিন বাইরে যেতাম। এবার একেবারেই অন্তরীন অবস্থায় কেটেছে। খারাপ লাগেনি। মানুষের সবই অভ্যাস হয়ে যায়।

পূজার আগে ২৮শে সেপ্টেম্বর N.C.C. Camp-এ গেছিলাম। সপ্তমীর দিনই ফিরলাম। বারবার শ্রীপ্রীতিকুমারের কথা মনে পড়ছিল। গত ১৯৬৪ সাল থেকে আমি N.C.C. Officer হিসাবে কাজ করছি। তখন বছরে একটি দুটি এমনকি তিনটি Camp ও আমাকে attend করতে হতো। বাংলাদেশের এমন একটি Camp ছিল না যেখানে শ্রীপ্রীতিকুমার না যেতেন, কখনও নীরেনদার সঙ্গে, কখনও বসাকবাবুর সঙ্গে, কখনও প্রয়াত মনোজ চৌধুরীর সঙ্গে, কখনও প্রদীপবাবুর সঙ্গে, কখনও বুলুবাবুর সঙ্গে। আমি তাঁকে সদাসর্বদা সপার্ষদ দেখেছি। একা থাকবার সুযোগ তাঁর ছিল না। শেষদিন পর্যন্ত তাঁর ঘর শূন্য ছিল না। শুধু সেই অন্তিমকালে তিনি সপুত্রক ছিলেন।

Camp-এ যেতে আমার আপত্তি থাকতো না। কারণ তখন বাড়িতে দু' তিনটি সারাদিনের লোক কাজ করত। বাপী কখনও আমার সঙ্গে Camp-এ থাকতো। প্রায় দ্বিতীয় দিন থেকেই শ্রীপ্রীতিকুমার যেতেন। সব Officer-ই তাঁকে খুব পছন্দ করতেন। সকলেই ছুটে আসতেন। একসাথে গোল হয়ে বসে চা খেতেন। হাসি ঠাট্টা করতেন। অসম্ভব রসিক ছিলেন। এত মিষ্টি করে আপ্যায়ন করতে আমি আর কাউকে দেখিনি। শুধু আমার জন্যই খাবার আনতেন না, সবার জন্য হিসেব করে আনতেন। সুন্দর করে সাজাতেন। বলতেন, "এই যে আসুন।" তিনি ছিলেন সকলের জামাইবাবু। এবার Camp-এ সাবিত্রী, দীপ্তি শুধু তাঁর কথা নিয়েই আলোচনা করতো। আমার সেই দিনগুলি অনেক ভালো ছিল। কোনও দায় ছিল না, দায়িত্ব ছিল না। শুধু হাসি হুল্লোড় আর আনন্দ।

আমি যখন Mountaineering করতে যাই, তখন বিভিন্ন সংবাদপত্রে News ছাপা হয়েছিল। কি খুশীই হতেন, সমস্ত কাগজ কিনে খবরগুলি আলাদা করে কেটে রাখতেন। আমার কৃতিত্বের পুরো আনন্দ তিনি নিজেও উপভোগ করতেন। আমি ফিরে এলে হুবহু সেই সব পথের বর্ণনা করে যেতেন। আজ আর মিথ্যা বলবো না - সত্যি পাহাড়ে পর্বতে আমি তাঁকে পাশে পাশে - বেশীরভাগ আগে আগে চলতে দেখতাম। তখন বুঝতে পারতাম না। ওখান

থেকে লিখে জানাতাম। এখন কিন্তু মনে মনে প্রণাম করি। স্পর্শ করার চেষ্টা করি না, জানি পাব না।

এবার ঝুলন পূর্ণিমার দিন অমরনাথ দর্শন করেছি। শেষনাগের হ্রদের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। আমার চোখের সামনে ছিলেন সেই শ্রীপ্রীতিকুমার। সেই সাদা ধবধবে ধুতি ও পাঞ্জাবী। তাঁর সেই তিরিশ বছর বয়সের মত চেহারা। কি সুন্দর যে দেখতে ছিলেন না দেখলে বোঝান যাবে না।

একবার আমি Delhi Republic Day Parade-এ যাবার জন্য selected হয়েছিলাম। তখন বাপীকে ছেড়ে থাকতে আমার খুব কষ্ট হোত। আমি বাপীকে ছেড়ে যেতে কিছুতেই রাজী না হওয়াতে West Bengal N.C.C. Directorate বাপীকে নিয়েই Delhi যাবার permission দিলেন। তখন N.C.C. Director General Office-এ Girls' Div.-এর charge-এ ছিলেন শ্রীমতী সুষমা ঝুনু দাশগুপ্তা (Miss Das Gupta)। কথা হোল বাপী তাঁর বাড়ীতে থাকবে। শ্রদ্ধেয়া সুলেখাদি (Lt. Col Sulekha Dutta) বললেন বাপীকে মিস দাসগুপ্তার বাড়ীতে রাখলে কারও কোন আপত্তি হবেনা। আগে যারা দিল্লী গেছেন, তারা বললেন মিস দাসগুপ্তার বাড়ীতে প্রায় শতখানেক বিভিন্ন জাতের কুকুর আছে। শ্রীপ্রীতিকুমার বিগড়ে গেলেন। তিনি কোনও অবস্থাতেই বাপীকে দিল্লী যেতে দিলেন না। ছেলের কোনও কষ্ট তিনি সহ্য করতে পারতেন না। অগত্যা বাপীকে রেখেই আমাকে যেতে হোল। সেই শেষ। আর কোনও দিন আমাকে দিল্লী যাবার জন্য রাজী করান যায় নি।

এখন তো আর আমার কোনও পিছুটান নেই। তাই শুধু ঘুরে বেড়াই। সব সময় সবাইকে বলে যেতে পারিনা। এমন অনেকে আছেন যাদের ব্যাখ্যা করতে হয় কোথায় যাবো, কতদিন থাকবো, সঙ্গে কে যাবে, কত খরচ ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি আজকাল ধাতস্থ হয়ে গেছি। শুধু হাসি। আমি জানি আমার বোঝা আমাকে বইতে হবে। আমাদের যাঁরা সাহায্য করেন তাঁদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। তাঁরা জানেন আমার মনোভাব। কিন্তু বাকীরা? ওরে বাব্বাঃ! শ্রীপ্রীতিকুমার যে বিশাল জনসঙ্ঘ সৃষ্টি করে গেছেন, তার ভারে আমি ধূলিস্যাৎ হয়ে যাব। সে দিনের আর কত দেরী? মাঝে মাঝে আমার চীৎকার করে উঠতে ইচ্ছে করে, "ওগো, তুমি এতগুলো লোকের ভালোবাসা আমার জন্য কেনো রেখে গেলে গো? আমার যে আর একা একা থেকে তোমাকে চিন্তা করা হচ্ছে না।" গীতাদিরা শুধু মাথা ঠাণ্ডা করে হেসে গড়িয়ে পড়ে। ভাবে আমি ঠাট্টা করছি।

আমার লেখার মধ্যে Inverted comma দিতে ভয় করে। Press থেকে সেটা এমন এক বাক্যের উপর ছাপা পড়ে যার অর্থ আমার বোধগম্য হয় না। পাঠকদেরও নিশ্চয়ই অসুবিধে হয়। শ্রীপ্রীতিকুমার নিজে প্রুফ দেখতেন, শ্রীমান সুনন্দন মাঝে মাঝে দেখে দেয়। তার পরও যা ভুল থাকে দেশ বিদেশ থেকে চিঠি আসে কারণ জিজ্ঞেস করে। আমি হার মানবার পাত্রী নই। সোজা বলে দিই– ওসব "ছাপাখানার ভূতের কাজ।" ইচ্ছে হয় পার্থসারথি পত্রিকা পড়বে, না হলে গ্রাহক হিসাবে নাম withdraw কর। তাহলে আমার একটি নাম কম লিখতে হবে, আমার খাটনি কমে যাবে। কিসের কি? তাঁরাই আবার দু'চারটি গ্রাহক বৃদ্ধি করে টাকা পাঠান।

একটা খবর দিয়ে শেষ করি। কটক প্রবাসী লেখিকা, পার্থসারথি পত্রিকার দীর্ঘদিনের গ্রাহিকা শ্রীমতী মঞ্জু সেনগুপ্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হোল। দীর্ঘদিন ধরে তাঁর সাথে আমার লুকোচুরি খেলা চলছিলো। তিনি পুরীতে আমার সাথে দেখা করতে যান তো আমি কলকাতায় আসি। আমি পুরী যাই তো তিনি কলকাতা আসেন। এবার রামগড়ের ঠিকানায় হানা দিয়ে তাঁর দর্শন পেয়েছি, সেকথা পরে লিখবো, কারণ আজ আমার সময় নেই। আমি আজ (১৫ই অক্টোবর, ১৯৮৯) বাবা বিশ্বনাথ দর্শনে যাত্রা করছি। ..... এবারের মতো শেষ .....।

– – – – – – – – – – – – – –

(** রচনাকাল – অক্টোবর, ১৯৮৯)

দুর্গা স্তোত্র

"মাতঃ দুর্গে! সিংহবাহিনী সর্ব্বশক্তিদায়িনী মাতঃ শিবপ্রিয়ে! তোমার শক্ত্যংশজাত আমরা বঙ্গদেশের যুবকগণ তোমার মন্দিরে আসীন, প্রার্থনা করিতেছি, – শুন, মাতঃ, উর বঙ্গদেশে, প্রকাশ হও।।"

শ্রীঅরবিন্দ

DO NOT COPY

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু ।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োহসি মে ।। (গীতা ১৮/৬৫)

স্বয়ং পার্থসারথি ভগবানের এই উক্তি অর্জুনকে - মন আমাতেই রাখ, আমিই তোমার যজ্ঞস্বরূপ। কাজ করে যাও, অবিচলিত ভক্তি স্রোত ঢেলে দাও সর্ববিধ ফল কামনা পরিত্যাগ করে। (সর্বসংকল্প সন্ন্যাসী) যোগারূঢ় হও, সমদর্শী হও।

বিদ্যাবিনয় সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি
শুনি চৈব স্বপাকে চ পণ্ডিতা সমদর্শিনঃ ।। (গীতা ৫/১৮)

গত মে মাসের তিরিশ তারিখের **অমৃতবাজার পত্রিকায়** (৩০.০৫.১৯৭৯) একজন এই ধরণের বিশিষ্ট গৃহী যোগীর কথা ও কাহিনী লিপিবদ্ধ হয়েছে, যিনি এই কলিকাতা শহরেই বসে আছেন তাঁর নিভৃত তপস্যার যগাসনে। অমৃতবাজার পত্রিকার মন্তব্যটি আমরা সম্পূর্ণই তুলে দিলাম ইংরেজীতে, তার বাংলা প্রতিবেদনও সঙ্গে রইলো পার্থসারথি পত্রিকার পাঠক পাঠিকাদের জন্য। কারণ এই মানুষটি তাঁদেরই প্রিয়জন। পার্থসারথি চক্রের হোতা নেতা ও সর্বাধিনায়ক এবং পার্থসারথির পুজ্যপাদ সম্পাদক।

Worldly Yogi – People from all walks of life come and approach him for his guidance. A simple man with a benign smile and radiant personality, he is not a sadhu in the accepted sense. He is a family man, but leads the life of a yogi, a sadhaka. What so many people daily come to him for is peace, which they get by talking to him.

Right from his early days he had a deep longing for a spiritual life. “I am grateful to my father who was a great help in initiating me into this life although I had to work on my own.” Though not a scholar, Sri Preeti Kumar Ghosh has written a number of treatises on the Gita and the Chandi,

DO NOT COPY

discussing the main principles of religion as revealed to him. Result? His books have inspired many readers while the monthly "Partha Sarathi" edited by him has gained wide acclaim. What does he teach or preach? Well, he is neither a teacher nor a preacher, for he is an introvert who talks only when asked. "I tell all to practise Brahmacharya without which one can never gain anything and to follow the tenets of truth minus which no solid base or foundation is possible. These sound rather simple but are very hard to attain."

Preeti Kumar never poses to be a guru and never tries to force anything on any person. Yet people come from far and near, seeking his blessings, and they must be getting something, call it what you may, to soothe their hearts. To his countless admirers and devotees he is really their friend, philosopher and guide."-- Amrita Bazar Patrika (30.05.1979)

সমাজের সর্বস্তরের লোকই তাঁর কাছে যাওয়া আসা করে উপদেশের জন্য, নির্দেশের জন্য। দেখতে একজন সাধাসিধে সাধারণ মানুষ, মুখে একটু স্মিত হাসি যার মধ্যে ডুবে আছে একটি গভীরতার ব্যাঞ্জনা, ব্যক্তিত্বের উজ্জ্বল ছটা। তিনি তথাকথিত সাধুসন্ন্যাসী নন অথচ এই সংস্রিয়মান সংসারে থেকেও অনাসক্ত যোগী ও সাধক।

প্রতিদিন কেন এত লোক আসে তাঁর কাছে? কেননা তাঁর সাথে কথা কইলে প্রাণে একটু শান্তির প্রলেপ পড়ে।

ছেলেবেলা থেকেই তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতি ছিল টান, উদগ্র অভীপ্সা। সেটা তাঁর পিতার অবদান, "আমি আমার বাবার কাছে গভীর ভাবে কৃতজ্ঞ যে তিনিই আমাকে এই পথে যাবার জন্য বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন, তবে আমাকে কাজ করতে হয়েছিল নিজেরই মত করে।" শ্রীযুক্ত প্রীতিকুমার ঘোষ একজন নামজাদা পণ্ডিত নন অথচ তিনি গীতা ও চণ্ডীর উপর কয়েকখানি

ভাষ্য লিখেছেন যাতে তার সাধনলব্ধ রহস্যের উপর নূতন আলোকপাত আছে – ফল? তাঁর লিখিত পুস্তক ও ব্যাখ্যাগুলি অনেকেরই মন স্পর্শ করেছে, অনুপ্রাণিত করেছে, বিশেষ করে তাঁর সম্পাদিত পার্থসারথি মাসিক পত্রিকার বহুবিস্তৃত জয়ধ্বনি আমরা শুনি। তিনি শিক্ষকও নন, প্রচারকও নন, গুরুও নন, তবু বহু জ্ঞানীগুণী বিদ্বজ্জন সমাজে তাঁর লেখার সমাদর আছে। তিনি অন্তঃপ্রজ্ঞ, তাঁকে কোন প্রশ্ন না জিজ্ঞাসা করলে কথা বলেন না। "আমি সবাইকে বলি ব্রহ্মচর্য পালন করো এবং সত্যকাম, সত্যসঙ্কল্প হয়ে সত্যকর্ম সাধন করো। সত্য থেকে বিচ্যুত হলে কোন জীবনের প্রতিষ্ঠান বেদীই অপ্রতিষ্ঠিত থাকে। ব্রহ্মচর্য পালন ও সত্যব্রত সাধন এই হচ্ছে প্রকৃত জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির দিগদর্শন। একথা বলা সহজ কিন্তু নিষ্ঠাভরে পালন করা শক্ত।"

শ্রীপ্রীতিকুমার গুরুর আসনে বসে এসব বলেন না। বা কারুর উপর তাঁর নিজের মত বা পথ চাপিয়ে বিধান তিনি দেন না। তবু লোক আসে দূর হ'তে নিকট হ'তে, তাঁর পূত আশীর্বাদ চায় – হয়তো বা কেন নিশ্চয়ই তারা কিছু পায়, সেটা যাই হোক (আশ্বাস, বিশ্বাস, ধ্যান, ধারণা, চেতনা ভ্রান্ত হোক, সত্য হোক) যাতে তাঁদের ক্ষতবিক্ষত মন কিছুটা শান্ত হয়। তাঁর বহু অনুরাগীদের কাছে তিনি সত্যই প্রিয় বান্ধব, উপদেষ্টা, পরামর্শদাতা। "হাত ধরে তুমি নিয়ে চল সখা, আমিত পথ চিনি না" – বিশ্বকবির এই কথাগুলোই মনে পড়ে।

"সকল উপাসনার সার এই শুদ্ধচিত্ত হওয়া ও অপরের কল্যাণ সাধন করা। যিনি দরিদ্র, দুর্বল, রোগী, সকলের মধ্যে শিব দেখেন, তিনিই যথার্থ শিবের উপাসনা করেন। আর যে ব্যক্তি কেবল প্রতিমার মধ্যে শিব-উপাসনা করে, সে প্রবর্তক মাত্র। যে ব্যক্তি জাতিধর্ম-নির্বিশেষে একটি দরিদ্র ব্যক্তিকেও শিব বোধে সেবা করে, তাহার প্রতি শিব, যে ব্যক্তি কেবল মন্দিরেই শিব দর্শন করে, তাহার অপেক্ষা অধিক প্রসন্ন হন।"

– স্বামী বিবেকানন্দ

DO NOT COPY

মহারাজ অশোকের চেষ্টায় ভারতে বৌদ্ধধর্মের প্রচার হয়। তাঁর দেহাবসানের সঙ্গে সঙ্গে ভারত থেকে ঐ ধর্মের অবলুপ্তি ঘটে। তখন শৈব, শাক্ত গাণপত্য এবং তান্ত্রিকরা অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে উঠল। কাপালিকরা নানা রকম ভেল্‌কী দেখিয়ে লোকদের বশীভূত করতে লাগল। এর ফলে বৈদিক ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব ম্লান হয়ে পড়ল। ধর্মে এলো অনাচার।

ধর্মে অনাচার ঈশ্বর সইতে পারেন না। তিনি ত' বলেছেন,-

'যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত
অভ্যুত্থানম্ অধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।
পরিত্রানায় হি সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম
ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।।'

ঈশ্বর পাঠালেন মহাপুরুষকে তাঁর শক্তি দিয়ে। এলেন বৈদান্তিক শ্রীশঙ্করাচার্য অদ্বৈতবাদ প্রচার করে প্রায় অবলুপ্ত বেদান্তের ধর্মকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে। তিনি বললেন একমাত্র ব্রহ্মই সত্য। তিনি এক এবং অদ্বিতীয়। ব্রহ্ম ছাড়া জগতে যা কিছু দৃশ্যমান বস্তু তা সবই অনিত্য এবং মায়াময় মিথ্যা।

কেরল প্রদেশে নাম্বুদিরি ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন বিদ্যাধিরাজ। বিদ্যাধিরাজ শিবের ভক্ত ছিলেন। এনার একটি সর্বসুলক্ষণযুক্ত পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম শিবগুরু। শিবগুরু দর্শন ও মীমাংসা শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। পরে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। মহাপণ্ডিতের কন্যার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়।

বিয়ের পর অনেকদিন কেটে গেল। নব দম্পতির কোন ছেলেপুলে হল না। তখন শিবগুরু ও তাঁর পত্নী শিবের কাছে কাতরভাবে প্রার্থনা জানালেন পুত্র সন্তান লাভের আশায়। একান্ত ভক্তিভরে নিত্য আরাধনা করতে লাগলেন।

তাঁদের আরাধনায় তুষ্ট হয়ে স্বয়ং শিব ব্রাহ্মণ বেশে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেন, 'ওহে শিবগুরু, তুমি সর্বগুণ সম্পন্ন অল্পায়ু একমাত্র পুত্র চাও, না গুণহীন দীর্ঘায়ু বহুপুত্র চাও?' শিবগুরু বললেন, 'আমি বহুগুণযুক্ত একমাত্র পুত্রই চাই। ব্রাহ্মণ বেশী শিব বললেন, 'তথাস্তু'।

অদৃশ্য হলেন ইষ্ট দেবতা। এর কিছুদিন পরে শিবগুরু একটি সুলক্ষণযুক্ত পুত্র লাভ করলেন। জগৎগুরু শঙ্করের বরে পুত্রলাভ করেছেন বলে তার নাম রাখলেন শঙ্কর। ৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে শঙ্কর জন্মগ্রহণ করেন। এক বছর বয়স থেকেই শঙ্কর কথা বলতে আরম্ভ করেন। দুবছর বয়সে দ্বিতীয় ভাগ পড়া শেষ করেন।

তিন বছর যখন বয়েস তখন শাস্ত্রজ্ঞ বিধানে তার চূড়াকরণ হয়। এই সময় তাঁর বাবা দেহ রক্ষা করেন। শঙ্করের যখন পাঁচ বছর বয়স তখন মা তাঁর উপনয়নের ব্যবস্থা করলেন। উপনয়নের পর শঙ্কর গুরুগৃহে গিয়ে শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ ও চতুর্বেদ অধ্যয়ন করেন।

পরে দর্শন, বেদান্ত, পূর্বমীমাংসা শিক্ষা করলেন। গুরুগৃহে অধ্যয়ন শেষ করে শঙ্কর ফিরে এলেন নিজের বাড়ীতে।

একদিন শঙ্করের জননী নদীতে স্নান করতে গিয়ে পড়ে যান। পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই চেতনা লোপ পেল।

শঙ্কর তখন মায়ের কাছে বসে অচৈতন্য শরীরের ওপর জলসিক্ত পদ্মপাতার বাতাস করতে লাগলেন। তাঁর জ্ঞান ফিরে এলো। পরদিন সকলে দেখল শঙ্করের বাড়ীর সামনে দিয়ে নদী বয়ে চলেছে।

শঙ্করের অলৌকিক কাজের কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। কেরলের রাজা রাজশেখর শঙ্করকে এই ব্যাপারে কিছু স্বর্ণমুদ্রা উপহার দিতে চাইলেন। শঙ্কর তা গ্রহণ করেন নি। তিনি নিজের বাড়ীতে একটি চতুষ্পাঠী বসিয়ে সেখানে বেদান্ত ও দর্শন শিক্ষা দিতে লাগলেন।

শঙ্করের মন সংসারে আসক্ত হয়নি দেখে মায়ের মনে এতটুকু শান্তি ছিল না। একবার কয়েকজন মনীষী তাঁর বাড়ীতে আসেন।

শঙ্করের মাতা তাঁদের দেখে বললেন, বাবা, আপনারা শঙ্করের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কিছু বলুন। মনিষীগণ বললেন, আপনার পুত্রের পরমায়ু অতি অল্প। তাই শুনে শঙ্করের মাতা মর্মাহত হলেন। আরও বুঝতে পারলেন, শঙ্কর সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করবেন। এইসব কারণে তাঁর মনে শান্তি ছিল না। শঙ্কর মাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলতেন, মা, তুমি আমার জন্য এতটুকু ভেব না। আমি তোমার অনুমতি ছাড়া সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করবো না। পুত্রের কাছে পরম আশ্বাস পেয়ে মা শান্ত হলেন।

DO NOT COPY

কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা অন্য। যাকে দিয়ে তাঁর কাজ করাবেন তাকে তাঁর প্রয়োজন। এভাবে সংসারমায়ায় আবদ্ধ হয়ে সে থাকবে এ ইচ্ছা ঈশ্বরের আদৌ ছিল না। তাই ছলেবলে শঙ্করকে সংসার ছাড়া করার উপায় প্রকাশ করলেন।

একদিন শঙ্কর নদীতে স্নান করতে নামলেন। জলে নামার সঙ্গে সঙ্গেই কুমীর এসে তাঁর পাদুটো কামড়ে ধরলো। শঙ্কর তখন চীৎকার করতে লাগলেন মা-মা। তাঁর এভাবে চীৎকার শুনে গর্ভধারিনী সশরীরে উপস্থিত হলেন। শঙ্কর তখন অশ্রুপূর্ণ নয়নে বললেন, মা, এই দেখ, কুমীরে আমার পা ধরেছে। যদি তুমি আমাকে সন্ন্যাস গ্রহণে অনুমতি দাও তবে আমি কুমীরের হাত থেকে মুক্ত হতে পারি। মা তখন নিরুপায় হয়ে বললেন, আমি অনুমতি দিচ্ছি, তুমি সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করো। শঙ্করের পাদুটো ছেড়ে দিল কুমীর। শঙ্কর আনন্দে হাসতে হাসতে তীরের ওপর উঠে এলেন। পরে জনৈক জ্ঞাতির হাতে মায়ের রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়ে তিনি সংসার ত্যাগ করেন।

নর্মদাতীরে এসে এক মুনির কাছে দীক্ষা নেন শঙ্কর। এই মুনি শঙ্করকে ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা দিলেন। এই সময়ে শঙ্করের অলৌকিক যোগক্রিয়া প্রত্যক্ষ করেছে অনেকে। গুরু গোবিন্দ নাথ শুয়ে নিদ্রা যাচ্ছিলেন। কুলু কুলু নিনাদে নর্মদা নদী বয়ে চলেছে। ঐ নদীর জলকল্লোলে পাছে গুরুদেবের নিদ্রাভঙ্গ হয় এই আশঙ্কায় শঙ্কর একটি কলসীর মধ্যে নদীর সমস্ত জল ভরে ফেললেন। আর জলকল্লোল শোনা গেল না। গুরুদেব শান্তিতে ঘুমোতে পারলেন।

বারানসী ধামে অবস্থান করছেন শঙ্কর। প্রতিদিন পুণ্যসলিলা গঙ্গার জলে অবগাহন করে বিশ্বেশ্বরের আরাধনায় বসেন। একদিন সকালে গঙ্গাস্নান করে ফিরছেন। পথের মধ্যে একটি লোককে শুয়ে থাকতে থেকে দেখে শঙ্কর মনে করলেন, লোকটি শূদ্র। স্পর্শ করলে অশুচি হবেন।

তিনি লোকটিকে পথ থেকে সরে যেতে বললেন। বললেন, ওরে চণ্ডাল-কুক্কুর-পথ ছাড়। লোকটি তাঁর কথা শুনে বললে, সে কি! বেদে বলা আছে, আত্মা এক, অনাদি, অদ্বিতীয়, পাপশূন্য, নিরঞ্জন, সত্য, জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ। অতএব আপনি কেন কুকুরের আত্মায় ও আপন আত্মায় পার্থক্যবোধ করছেন?

ঐ কথা শোনার পর থেকে শঙ্করের মনে ভাবান্তর এলো। অজ্ঞানজনিত মোহ দূর হলো। ভাবলেন, চণ্ডাল তো চণ্ডাল নয়। সে যে সাক্ষাৎ শঙ্কর। সেই

থেকে শঙ্করের মন থেকে আত্মার পৃথকত্ব লোপ পেল। সকলের মধ্যে এক ঈশ্বরের রূপই নানা ভাবে প্রত্যক্ষ করতে লাগলেন।

কাশীতে থাকার সময় পদ্মপাদ, চিৎমুখ, আনন্দগিরি প্রভৃতি ব্যক্তিগণ শঙ্করের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। কাশীধাম ত্যাগ করে শঙ্কর কুরুক্ষেত্র হয়ে বদ্রিকাশ্রম যাত্রা করলেন। সেখানে থেকে তিনি দশখানি উপনিষদের ভাষ্য এবং গীতা ভাষ্য লেখেন। গীতার ভাষ্য লেখা শেষ হলে তিনি 'সনৎ সুজাতীয়' ও 'নৃসিংহ তাপণীয়ে'র ব্যাখ্যা করেন। তারপর তাঁর 'উপনিষদ-সহস্রিকা' নামে অসংখ্য সদুপদেশ পূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশিত হলো।

তঁর 'বেদান্ত ভাষ্য' অদ্বৈতবাদীদের কাছে এক পরম আদরের ধন। সশিষ্য বদরিকাশ্রমে বাস করার পর শঙ্কর কাশী ধামে ফিরে এলেন। এই সময় একদিন এক ব্রাহ্মণ এসে শঙ্করকে ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা করতে বললেন। এই ব্রাহ্মণ আর কেউ নন, ইনি হলেন স্বয়ং ব্যাসদেব। শঙ্করকে পরীক্ষা করবার জন্যে তিনি এলেন। শঙ্করের মুখে ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা শুনে আনন্দিত হন। শঙ্করকে বললেন, আমি তোমার ওপর সন্তুষ্ট হয়েছি। তুমি এই ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা নিয়ে জগতে অদ্বৈতবাদ প্রচার কর।

শঙ্কর বললেন, আমার আয়ুষ্কাল মাত্র ষোল বছর। ব্যাসদেব বললেন, আরও ষোল বছর বাড়িয়ে দিলুম। বত্রিশ বছর পর্যন্ত তোমার আয়ু স্থির হলো। অতঃপর শঙ্কর দিগ্বিজয়ে বের হলেন। মাহিষ্মতি নগরে পন্ডিত মণ্ডন মিশ্র এবং তাঁর স্ত্রী উভয় ভারতীকে পরাস্ত করে তিনি অদ্বৈত মত প্রতিষ্ঠা করলেন। মণ্ডন মিশ্র শঙ্করের কাছে দীক্ষা নিয়ে শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন।

ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতে কয়েকটি স্থানে ঘুরে শঙ্কর সমস্ত ধর্ম সম্প্রদায়কে বিচারে পরাস্ত করে অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠিত করলেন।

এই মত প্রচারের জন্যে তিনি ভারতের চার দিকে চারটি মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। সেগুলি নিম্নরূপঃ

১। দক্ষিণে রামেশ্বর ক্ষেত্রে শৃঙ্গগিরি মঠ।
২। উত্তরে বদরিকাশ্রমে জ্যোতিঃ মঠ।
৩। পশ্চিমে দ্বারকাক্ষেত্রে সারদামঠ।
৪। পূর্বদিকে পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে গোবর্দ্ধন মঠ।

DO NOT COPY

শঙ্কর যে অদ্বৈতবাদ প্রচার করলেন তার সারমর্ম হচ্ছে,-

১। পরমার্থতঃ সৎপদার্থ একটি। তাই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ স্বরূপ।

২। ব্রহ্ম মায়া বা অবিদ্যা নাম্নী একটি শক্তির সঙ্গে সংযুক্ত। অবিদ্যা দ্বারাই জগতের প্রতীতি হয়।

৩। এই ব্যবহারিক জগৎ কতকগুলি জীবাত্মা এবং তাদের বিষয়ীভূত বস্তুসমূহে পরিপূর্ণ। এসব জীবের জ্ঞান এবং জ্ঞানের বিষয় এ দুটোই অসৎ। কেননা তা' অবিদ্যা পরিকল্পিত।

৪। অজ্ঞান জীব মায়া প্রভাব অতিক্রম করে যথার্থ বস্তুর জ্ঞানলাভ করতে পারে না। কেননা মায়া বস্তুর যাথার্থ্যকে আবরণ করে রেখেছে।

৫। বেদের কর্মকান্ড মুক্তি লাভের সহায়তা করতে পারে না। জ্ঞান কান্ডের দ্বারাই মুক্তি লাভ করা যায়।

বীরভক্ত তুলসীদাসের অলৌকিকত্ব **ব্রহ্মচারী অরুপচৈতন্য**

শ্রীরামভক্ত এবং ভারত বিখ্যাত সাধক তুলসীদাসের জীবনে অলৌকিক বিভূতির অভাব ছিল না। তিনি নিজের জীবনে যেমন তাঁর ইষ্টদেবতা শ্রীরামচন্দ্রের অলৌকিক বিভূতির প্রকাশ লক্ষ্য করেছিলেন তেমনই নিজেও অনেক অলৌকিক বিভূতির প্রকাশ দেখিয়েছেন। এখানে ভক্ত তুলসীদাস, বীর তুলসীদাসের জীবনের কয়েকটি অলৌকিক লীলার কথা লিখছি।

ঘন্টাকর্ণ যোগীর শিষ্য হচ্ছেন তুলসীদাস। তাঁর অলৌকিক বিভূতির শেষ নেই। মহাযোগী গুরুর কাছে দীর্ঘকাল ব্যাপী যোগ শিক্ষা করার ফলে তিনি লাভ করেছেন বহু অলৌকিক যোগশক্তি। তার বলে তিনি বহু দুঃস্থ ও দীন-দুঃখীদের উপকার করেছেন।

একদিন এক কুঁজো লোক এসে অসহায় ভাবে তাঁর সামনে দাঁড়ালো। সে তাঁর কৃপাপ্রার্থী। অন্তর্যামী তুলসীদাস সহজেই বুঝতে পারলেন কুঁজো লোকটির মনের কথা। তিনি কৃপা করলেন। কুঁজো লোকটার পিঠে একবার মাত্র হাত বুলিয়ে দিলেন। ব্যাস্! তাতেই কাজ সারা।

DO NOT COPY

কুঁজো লোকটার কুঁজ ভাল হয়ে গেল। তার পিঠ স্বাভাবিক হয়ে উঠলো। সে সাধারণ মানুষের মত সোজা হয়ে দাঁড়াতে লাগলো। তাকে আর কেউ কুঁজো বলে হাসিঠাট্টা করতে সাহস করে না।

দিন দিন মহাযোগী এবং রামভক্ত তুলসীদাসের অলৌকিক লীলামাহাত্ম্য চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। বহু দুঃখী তাঁর পদপ্রান্তে এসে দাঁড়াতে লাগলো তাঁর কৃপার জন্যে। সেবার সূর্যগ্রহণ উপলক্ষ্যে মুক্তিস্নানের জন্যে বহু পূর্ণার্থী নরনারী এবং সাধুসন্ত এসেছেন কাশীর পবিত্র জাহ্নবীর ঘাটে।

বহু সংসারী মানুষ সাধুসঙ্গ লাভের আশায় ঘন্টার পর ঘন্টা দঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে গঙ্গার ঘাটে ঘাটে। এমনি একজন হলেন এক বৃদ্ধ। তাঁর সঙ্গে একটি ছেলে ছিল। সে অন্ধ। বৃদ্ধের একমাত্র ছেলে এবং একমাত্র অবলম্বন।

ছেলেটি অন্ধ হয়েছে বলে বৃদ্ধের মনে দুশ্চিন্তার আর অন্ত নেই। তবে তিনি শুনেছেন সাধক ও মহাযোগী তুলসীদাসের অলৌকিক বিভূতির কথা। তাঁর নাকি অশেষ এবং অসাধারণ ক্ষমতা। যোগশক্তি প্রয়োগের দ্বারা নাকি তিনি অনেক অসম্ভব কাজও সম্ভব করতে পারেন।

তাই বৃদ্ধ এসেছেন ছেলেটিকে সঙ্গে নিয়ে তুলসীদাসের অপার অমিয় কৃপা পাবার আশায়। তাঁর ধারণা, তুলসীদাস কৃপা করলে তাঁর ছেলে অনায়াসে চক্ষুষ্মান হয়ে উঠবে।

নির্দিষ্ট সময়ে তুলসীদাস রাম নাম গান করতে করতে সশিষ্য এগিয়ে আসতে লাগলেন কাশীর বিখ্যাত মনিকর্ণিকার ঘাটে দিকে। বৃদ্ধ তাঁকে দেখে এগিয়ে এলেন। চলমান যোগীবরের চরণ প্রান্তে পড়ে কাতর কন্ঠে প্রার্থনা জানাতে লাগলেন, সাধু বাবা, ছেলেটি আমার বুড়ো বয়সের ধন। আর কেউ নেই বাবা। দয়া করো বাবা। নইলে চরণ ছাড়বো না।

এই বলে তিনি তুলসীদাসের পা'দুখানি জড়িয়ে ধরলেন। দুঃস্থ ও শোকার্ত জীবের উপকার করাই হচ্ছে যোগীবরের প্রিয়তম কর্ম এবং ধর্মও বটে। তাই তিনি বৃদ্ধকে হাত ধরে তুলে নিলেন এবং তাঁর পুত্রকে আলিঙ্গন করে বললেন, বৎস, তুমি অন্ধ। চক্ষুষ্মান হবার সাধ। আচ্ছা, রামজীর কৃপাবলে তুমি অচিরে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবে। বাক্‌সিদ্ধ মহাপুরুষের কথাই সত্যি হোল। তাঁর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেল আগন্তুক ঐ বৃদ্ধের ছেলেটি।

DO NOT COPY

তাই লক্ষ্য করে বৃদ্ধ তুলসীদাসের পাদবন্দনা করতে লাগলেন। সেই সঙ্গে পুত্রও তুলসীদাসের পা'দুখানি ভক্তির অশ্রুজলে ভিজিয়ে দিতে লাগলো। এরপর বৃদ্ধ অপরিসীম আনন্দে আত্মহারা হয়ে তুলসীদাসকে উপলক্ষ্য করে বলতে লাগলেন, বাবা, আজ হতে আমরা পিতা-পুত্রে তোমার দাস হলুম।

তুলসীদাস বললেন, বৃদ্ধ, তুমি আমার পিতা স্থানীয়। অমন কথা বোল না। তোমার পুত্রকে আশীর্বাদ করি, সে দীর্ঘজীবি হোক। তুমি পুত্রকে নিয়ে সংসার করো গে। একাজে আমার কোন কৃতিত্ব নেই। পূর্ণব্রহ্ম ভগবান রামচন্দ্রের ইচ্ছায় এইসব হচ্ছে। আমি উপলক্ষ্য মাত্র।

এই বলে তুলসীদাস ছাত্র ও শিষ্যদের সঙ্গে মণিকর্ণিকার ঘাট অভিমুখে অগ্রসর হলেন। ঐদিন ঐ সময়ে আর একটি অলৌকিক ঘটনা ঘটে গেল তুলসীদাসকে কেন্দ্র করে এক সদ্য বিধবার জীবনে।

এক সতীনারী তার পতিকে হারিয়েছে। তখনকার দিনে সহমরণে যেতো সতীনারী। তাই সেদিন এই নারী হাতে শাঁখা, মাথায় সিঁদুর পায়ে আলতা ও গায়ে চওড়া পাড় দেওয়া গরদের কাপড় পরে বহু আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে চলেছে হরিশচন্দ্র ঘাটে শ্মশানের দিকে। সেখানে তার মৃত স্বামীকে আগেই নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এবার এই রমণী চলেছে। তাকে অনুসরণ করছে তার আত্মীয়-স্বজন ও অন্যান্য পরিচিত নরনারী।

রমণী হঠাৎ তুলসীদাসের সামনে এসে দাঁড়ালো। জনৈক বয়স্থা স্ত্রীলোক বললে, মা আজ তোমার বড় শুভদিন। আজ এই শুভ সূর্যগ্রহণের দিনে পতি অনুগামিনী হবার সময় দেবতা-ব্রাহ্মণের আশীর্বাদ নাও। আর এই মুক্ত পুরুষ সাক্ষাৎ দেবকল্প মহাত্মা তুলসীদাসের চরণে প্রণাম করে অভীষ্ট বর প্রার্থনা করো।

রমণী তখন সহাস্যে গলবস্ত্র হয়ে তুলসীদাসের চরণে প্রণত হয়ে বললে, ঠাকুর আশীর্বাদ করুন, যেন মনোবাসনা পূর্ণ হয়। তুলসীদাস অতি কোমলস্বরে বললেন, মা, তোমার মনোবাসনা পূর্ণ হোক। মনের আনন্দে পতিসহ সুখে সংসার যাত্রা নির্বাহ করো। রামজীর কৃপায় তোমাদের সংসার উজ্জ্বল ও সুখময় হোক।

রমণীর দুচোখে ধারা নামলো তুলসীদাসের এ হেন কথায়। সঙ্গে সঙ্গে তার মনের মধ্যেও খেলা করতে লাগলো বিস্ময়ের চক্‌মকি। সে নিজেকে প্রাণপণে সংযত করে বললে, প্রভু, আপনি কি আশীর্বাদ করলেন! আমার পতি যে সকালে ইহলোক ত্যাগ করেছেন। আমি যে তাঁর সঙ্গে সহমরণে যাবো বলে তৈরী

হয়ে এসেছি। এখন যে আমি শ্মশানে যাচ্ছি। এরূপ অবস্থায় ঠাকুর আপনি কিরূপ আশীর্বাদ করলেন? রমণীর কথায় বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না তুলসীদাস। তিনি স্বাভাবিক ভাবে বললেন, মা, তার জন্যে আর চিন্তা কি? আমার কথা নিষ্ফল হবার নয়। তোমার অদৃষ্টে বৈধব্য যোগ নেই। ভগবান শ্রী রামচন্দ্র তাঁর এই চিরানুগত দাসের দ্বারা আবার একটা নতুন কীর্তি দেখাবেন বলে আমার মুখ দিয়ে এমন কথা বের করেছেন। চলো দেখি, তোমার স্বামী কোথায়!

তুলসীদাস রমণীর সঙ্গে এলেন হরিশচন্দ্র ঘাটে। ওদিকে শ্মশানের চারিধারে লোকে লোকারণ্য। সকলে যোগীবর ও বিখ্যাত সাধকের অলৌকিক মাহাত্ম্য চাক্ষুষ অবলোকন করবার জন্যে দঁড়িয়ে আছে হরিশ্চন্দ্র ঘাটে। তুলসীদাস এক জায়গায় স্থির হয়ে দঁড়িয়ে তাঁর ইষ্টদেবকে স্মরণ করে বলতে লাগলেন, প্রভু, এ কাজ তোমারই। তুমি যেমন বলিয়েছ আমি তেমনি বলেছি। এখন তোমার করুণা বলে যেন মাতৃসমা এই রমণীর বৈধব্য দূর হয়। তোমার জয় নিনাদে যেন ভুবন ভরে যায়। এরপর রমণীর দিকে তাকিয়ে বললেন, কই মা, তোমার পতির মৃতদেহ? রমণী অশ্রুসিক্ত নয়নে বললে, এই যে প্রভু, আমার স্বামীর মৃতদেহ।

যোগী ও ভক্ত তুলসীদাস খাটের ওপর শোয়ানো শবের পাশে বসে তার গায়ে হাত দিয়ে বললেন, আমি যদি রামনাম জপে কিছুমাত্র পুণ্য সঞ্চয় করে থাকি, সেই পুণ্যফলে হে শব, তুমি নবজীবন লাভ করে রামনাম গাইতে গাইতে গাত্রোত্থান করো। রামনামের প্রভাব জগতে পরিব্যাপ্ত হোক। জগত দেখুক, রামনামের বলে জগতে কত অসাধ্য সাধন ঘটতে পারে।

সিদ্ধ সাধকের প্রাণান্তিক প্রার্থনা এবং তাঁর পবিত্র হাতের স্পর্শে স্পন্দিত হল শবদেহ। পরক্ষণে প্রাণ ফিরে পেয়ে মুখে পবিত্র নাম জপ করতে করতে খাটিয়ার ওপর উঠে বসলো। দর্শকগণ ঐ অলৌকিক দৃশ্য দেখে আর স্থির থাকতে পারলো না। তারা সমস্বরে রামজীর জয়গান করতে লাগলো। পরে তারা সকলে এসে সাধকশ্রেষ্ঠ তুলসীদাসের চরণ ধূলি গ্রহণ করে ধন্য হলো।

পরে তুলসীদাস সেই নবদেহীর হাত ধরে রমণীকে বললেন, মা, এই তোমার স্বামীকে গ্রহণ করো এবং পরম সুখে সংসার যাত্রা নির্বাহ করো। সুখেদুঃখে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের নাম জপমালা করো। তাহলে সংসারে আর কোন কষ্ট থাকবে না।

এদিকে নবদেহধারী যুবক তুলসীদাসের কৃপায় প্রাণ ফিরে পাবার পর তাঁর প্রতি অনুরক্ত হয়ে উঠলো। সে তুলসীদাসের চরণ যুগল ধরে বললে, ঠাকুর, যে নামের এত শক্তি, যে নাম মৃত প্রাণে জীবন সঞ্চার করতে পারে সে নাম ঘরে বসে হবে না। আমি আজ হতে আপনার সঙ্গে ভগবানের মহিমা কীর্তন করে সাধু সঙ্গে জীবন অতিবাহিত করবো। আপনি আমাকে শিষ্য বলে গ্রহণ করুন।

তুলসীদাস বললেন, না বৎস, আমি তোমার সতী পত্নীর কাছে প্রতিশ্রুত হয়েছি। অতএব তা হতে পারে না। তুমি অতি নিবিষ্ট চিত্তে ঘরে বসে সস্ত্রীক প্রভুর নাম করলে কখনই বিফল মনোরথ হবে না। যাও বৎস, ঘরে যাও।

যুবক সস্ত্রীক তুলসীদাসের কথা শুনে ঘরে ফিরে গেল। উপস্থিত সকলে তুলসীদাসের অলৌকিক যোগশক্তি লক্ষ্য করে অবাক হয়ে গেল।

ভক্ত বৎসল শ্রী রামকৃষ্ণ **শ্রী প্রণব ঘোষ**

স্বামী অভেদানন্দ

কালী প্রসাদ চন্দ্র (স্বামী অভেদানন্দ) যোগ শিক্ষার আকাঙ্খা নিয়ে ঠাকুরের কাছে গিয়েছিলেন। ঠাকুরও সানন্দে তাঁকে শিক্ষা দিতে সম্মত হন। দক্ষিণেশ্বরে উত্তরের বারান্দায় একখানা তক্তাপোষে যোগাসনে বসিয়ে ঠাকুর প্রথমে কালী প্রসাদের জিভে বীজমন্ত্র লিখে দেন, তারপর ডান হাত দিয়ে বুকের দিক থেকে উপরের দিকে শক্তি আকর্ষণ করেন। সঙ্গে সঙ্গে কালীপ্রসাদ গভীর ধ্যানে মগ্ন হন। কিছুক্ষণ বাদে ঠাকুর নীচের দিকে শক্তি নামিয়ে আনলে কালীপ্রসাদও ধ্যান থেকে ব্যুত্থিত হন। তারপর ঠাকুর তাঁকে প্রয়োজনীয় উপদেশ দিয়ে মিষ্টিমুখ করিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দেন। যাবার সময় বলে দেন, "আবার এসো। যদি পয়সা যোগাড় না হয়, তাহলে এখান থেকে দেওয়া হবে।" সর্বজ্ঞ ঠাকুর প্রথম দর্শনেই কালীপ্রসাদের জন্মান্তরের সংস্কার জানতে পেরেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "তুমি পূর্বজন্মে যোগী ছিলে। কিন্তু তোমার একটু বাকী ছিল। এই তোমার শেষ জন্ম।" তাই ঠাকুর ভক্তের যোগ শিক্ষাকে সম্পূর্ণতা দান করতে কালক্ষেপ করেননি।

ঠাকুরের নির্দেশ মেনে ধ্যান করতে করতে কালীপ্রসাদের নানা দর্শনাদি হতে থাকে। তিনি নিয়মিত দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে সব কথা নিবেদন করতেন। ঠাকুরও তাঁকে উচ্চ শিক্ষা দিতেন। একদিন ঠাকুরের শ্রীচরণে হাত বুলাতে বুলাতে কালীপ্রসাদ অনুভব করেছিলেন ঠাকুর যেন জগন্মাতা রূপে তাঁকে স্তন্যপান করাচ্ছেন। আর একদিন ধ্যানে বসে উপলব্ধি করেছিলেন তাঁর আত্মা দেহ ছেড়ে উর্দ্ধলোকে চলতে চলতে একটি মনোরম প্রাসাদে প্রবেশ করে। সেই প্রাসাদের একটি বিশাল কক্ষে নানা ধর্মের দেবদেবী ও অবতারগণ উপবিষ্ট ছিলেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ কক্ষের মধ্যস্থলে দঁড়িয়ে ছিলেন। পরে তিনি দেখলেন, সব দেবদেবী ও অবতারগণ ঠাকুরের জ্যোতির্ময় বিরাট দেহে একীভূত হয়ে গেলেন। এই দর্শনের কথা শুনে ঠাকুর কালীপ্রসাদকে বলেছিলেন, "তোর বৈকুন্ঠ দর্শন হয়ে গেল। এখন থেকে তুই অরূপের ঘরে উঠলি, আর রূপ দেখতে পাবি না।"

ঠাকুর গলরোগের চিকিৎসার জন্যে প্রথমে শ্যামপুকুর পরে কাশীপুরে ছিলেন। ঐ অবস্থাতেও তিনি কালীপ্রসাদকে যোগ সাধনা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতেন। ইতিমধ্যে নরেন্দ্রনাথের প্রভাবে তাঁর ভাব বিপর্যয়ের সম্ভাবনা দেখা দেয়। নরেন্দ্রনাথ অনুভব করেন তাঁর মধ্যে অলৌকিক ক্ষমতা সৃষ্টি হয়েছে। একদিন তিনি কালীপ্রসাদকে সামনে বসিয়ে বললেন, "আমাকে খানিক্ষণ ছুঁয়ে থাকতো।" কালীপ্রসাদ দু-এক মিনিট মাত্র ছুঁয়ে ছিলেন। ঐ সময় তাঁর মনে হয়েছিল ব্যাটারি ধরলে যে কি একটা ভিতরে আসছে জানতে পারা যায় এবং হাত কাঁপে নরেন্দ্রনাথকে ছুঁয়েও তাঁর তেমনি অনুভব হয়েছিল। সর্বদর্শী ঠাকুর অন্যত্র অবস্থান করেও এই ঘটনা জানতে পেরেছিলেন। নরেন্দ্রনাথকে ডেকে বলেছিলেন, কিরে? একটু জমতে না জমতেই খরচ? ওর ভিতর তোর ভাব ঢুকিয়ে ওর কি অপকারটা কল্লি বল দেখি। ও এতদিন একভাব দিয়ে যাচ্ছিল, সেটা সব নষ্ট হয়ে গেল। ছয় মাসের গর্ভ যেন নষ্ট হল...। যাহোক ছোঁড়াটার অদেষ্ট ভাল। এই ঘটনা সত্যিই কালীপ্রসাদের পক্ষে ক্ষতিকর হয়েছিল। আগের ভাব পুরোপুরি নির্মূল হয়ে গিয়েছিল কিন্তু অদ্বৈত ভাব তখনও ঠিক ঠিক বুঝে উঠতে পারেননি। ফলে বেদান্তের দোহাই দিয়ে সদাচার বিরোধী কাজে লিপ্ত হতেন, যেমন একদিন তিনি ছিপ দিয়ে মাছ ধরছিলেন। ঠাকুর তাঁকে নিষেধ করেন। "আত্মা কাহাকেও মারেন না, কাহারও দ্বারা হতও হন না"-এই গীতা বাক্য আবৃত্তি করে তিনি নিজের কাজ সমর্থন করেন। ঠাকুরের কৃপাতেই একদিন

এই ভাব বিপর্যয়ের অবসান হয়। একদিন ঠাকুর নিজের বিছানায় শুয়ে কালীপ্রসাদের সঙ্গে কথা বলছিলেন। হঠাৎ বিষম যন্ত্রণায় তিনি বলতে থাকেন, "দ্যাখ, বাইরে ওকে ঘাসের উপর দিয়ে চলতে বারণ কর; আমার বড় কষ্ট হচ্ছে – ও যেন আমার বুকের উপর দিয়ে মাড়িয়ে যাচ্ছে।" প্রকৃত অদ্বৈত ভাব কি সেদিনই কালীপ্রসাদ প্রথম অনুভব করলেন।

'অষ্টাবক্রসংহিতা' পাঠে কালীপ্রসাদের মনে নাস্তিকতার ভাব এসেছিল। ঠাকুরকেও তিনি বলতে দ্বিধা করেন নি যে তিনি ঈশ্বর, শাস্ত্র, লোকাচার কিছুই মানেন না। ঠাকুর তাঁকে বলেছিলেন, "একদিন তুই সব মানবি।" ঠাকুরের কৃপায় কালীপ্রসাদের সে ভাবও কেটে যায়।

কালীপ্রসাদ ঠাকুরের কাছে ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য প্রার্থনা করেন। ঠাকুর আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন, "তোর ঠিক ঠিক ব্রহ্মজ্ঞান হবে।" ঠাকুরের কৃপায় তিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছিলেন। ধ্যানে একদিন ঐ ভাবের আস্বাদ পেয়ে তিনি ঠাকুরকে সব জানালে ঠাকুর বলেছিলেন, "এই ঠিক ঠিক জ্ঞান।"

এই ঠাকুর অপার স্নেহে তাঁর ভক্ত সন্তানের জ্ঞান ও উপলব্ধির ভাণ্ডারটি ধীরে ধীরে পূর্ণ করে তোলেন।

স্বামী অদ্ভুতানন্দ

লাটু মহারাজ অর্থাৎ স্বামী অদ্ভুতানন্দ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অদ্ভুত সৃষ্টি। ঠাকুরের গৃহীভক্ত রামচন্দ্র দত্তের বাড়িতে তিনি বাল্যকালে গৃহভৃত্য ছিলেন। রামবাবুর সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে তিনি ঠাকুরকে দর্শন করেন এবং ঠাকুরের কৃপাস্পর্শে তিনি ধীরে ধীরে একজন সমর্থ সাধকে পরিণত হন।

প্রথম দিন লাটুকে দেখেই ঠাকুর বুঝেছিলেন তিনি নিত্য সিদ্ধ। পাথর চাপা ফোয়ারার মতো হয়ত তাঁর জ্ঞান চাপা আছে। একটু উস্কে দিলেই ফর ফর করে বেরিয়ে পড়বে। রামবাবুকে ঠাকুর বলেছিলেন, "একে কোথায় পেলে? এর যে সাধুর লক্ষণ দেখছি।" তারপর ছুঁয়ে দিতেই দেখা গেল লাটুর রোমাঞ্চ হল, ওষ্ঠ ঘন ঘন কাঁপতে লাগল আর চোখ দিয়ে অঝোরে জল গড়াতে লাগল। যাবার আগে ঠাকুর আবার স্পর্শ করলে লাটুর ভাব সংবরণ হয়। লাটু প্রাণে প্রাণে জানলেন ঠাকুরই তাঁর প্রাণের দেবতা। আর ঠাকুরও তাঁর প্রিয় সন্তানকে

সাদরে আহ্বান জানিয়ে বললেন, "ওরে, আসিস। এখানে মাঝে মাঝে আসবি, জানিস।"

ঠাকুরের টানে লাটু দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করতে লাগলে, রামবাবুর বাড়িতে আর তিনি থাকতে চান না। ঠাকুরকে ধরে বসলেন, "আমি আর ওখানে যাবো না, আমি এখানে থাকব।" বায়ু পরিবর্তনের জন্যে ঠাকুরের তখন কামারপুকুর যাওয়া ঠিক হয়েছে, সে যাত্রা লাটুকে ফিরে যেতে হয়। যাবার আগে ঠাকুর তাঁকে অনাসক্তভাবে মনিবগৃহে থাকার কৌশলটি শিখিয়ে দিয়েছিলেন। পরে লাটু মহারাজ বলেছিলেন, তাঁর কত কৃপা। তিনি দেশে যাবার আগে আমায় কেমন সুন্দর শুনিয়ে গেলেন, মনিবের সংসারে কেমন করে থাকতে হয়। কিন্তু আমার মনের দুঃখ যাবে কেন?

ঠাকুর কামারপুকুর চলে গেলেও লাটুর ঠাকুরের জন্যে মন খারাপ হলে দক্ষিণেশ্বরে চলে যেতেন এবং গঙ্গা তীরে বসে কাঁদতেন। মনের দুঃখে কাঁদতে কাঁদতে একদিন লাটু মহারাজ ঠাকুরের দেখা পেয়েছিলেন। দেখা মাত্র লাটু ঠাকুরকে প্রণাম করবার জন্যে মাটিতে মাথা ঠেকান। এমন সময় সেখানে হঠাৎ ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র রামলাল দাদা এসে পড়েন। প্রণামান্তে মাথা তুলে তাঁকে দেখে লাটু জিজ্ঞাসা করেন, "পরমহংস মশায় কোথায় গেলেন?" রামলালদাদা তো অবাক। তিনি কি করে বুঝবেন ভক্তের ব্যাকুলতায় তিনি কামারপুকুর থেকে এসে দেখা দিয়ে গেছেন।

আট মাস বাদে ঠাকুর কামারপুকুর থেকে ফিরলে লাটু পুনরায় দক্ষিণেশ্বরে থাকার জন্যে বায়না ধরেন। ভক্তের দাবিতে শেষ পর্যন্ত ঠাকুর রামবাবুকে বলেন, দেখ, রাম, এই ছেলেটিকে তুমি আমার কাছে রেখে দাও। ছেলেটি বড় শুদ্ধ সত্ব, আর এখানে থাকতে ভালবাসে। লাটুর মনস্কামনা পূর্ণ হয়। ঠাকুরের সেবক হয়ে তিনি দক্ষিণেশ্বরে বাস করতে থাকেন।

ঠাকুর তাঁর প্রিয় সেবককে বর্ণপরিচয় থেকে অধ্যাত্ম বিদ্যা পর্যন্ত সব কিছু শিক্ষা দিতেন। একদিন ঠাকুরের পদসেবায় রত লাটুকে ঠাকুর জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "বল দিকিনি, তোর রামজী এখন কি করছেন?" কথার অর্থ বুঝতে না পেরে লাটু নীরব রইলেন। তখন ঠাকুর নিজেই উত্তর দিলেন, 'এখন তোর রামজী সূচের ভিতর হাতী চালাচ্ছেন।" অনেক পরে এই কথার অর্থ বুঝে লাটু

মহারাজ বলেছিলেন, 'আমার এতটুকু আধার; আমার মধ্যে তিনি সাধন ঢেলে দিচ্ছিলেন।"

ঠাকুর কোন কোন ভক্তকে আহার সম্পর্কে সতর্ক হতে বলতেন। সেই সতর্ক বাণী শুনে লাটুও আহার কমিয়ে দেন। তাতে লাটুর স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। ঠাকুর লাটুকে পাশে বসিয়ে খাওয়ালেন এবং পাতে ঘি ঢেলে দিলেন, যাতে তিনি আহারের দিকে নজর দেন। সেই থেকে লাটু আহার বিষয়ে মধ্যপন্থা অনুসরণ করতেন।

একদিন ঠাকুর লাটুকে বলেছিলেন, "ওরে দেখিস, একে (নিজেকে দেখিয়ে) যেন ভুলিস না।" ইঙ্গিতে পণ্ডিত বোঝে। লাটুত' বুঝে নিলেন ঠাকুরই তাঁর সব- ইষ্ট, আরাধ্য। সেই থেকে তিনি ঠাকুরকে ঈশ্বরভাবে সেবা করতেন।

শ্রীশ্রীমায়ের সেবায়ও ঠাকুর লাটুকে নিযুক্ত করেছিলেন। একদিন গঙ্গাতীরে লাটু একা একা বসে আছেন দেখে ঠাকুর বললেন, "ওরে লেটো, তুই এখানে বসে আছিস, আর উনি যে নহবতে রুটি বেলার লোক পাচ্ছেন না।" তারপর তাঁকে মায়ের কাছে নিয়ে গিয়ে বলেন, "এ ছেলেটি বেশ শুদ্ধসত্ব।... তোমার যখন যা প্রয়োজন হবে একে বলো, এ করে দেবে।" মাতৃসেবার এই দুর্লভ সুযোগ পেয়ে লাটু নিজেকে ধন্য মনে করলেন।

লাটু মহারাজ ঘুমকাতুরে ছিলেন। ঠাকুরের শাসনে তাঁর এই স্বভাবের পরিবর্তন হয়েছিল। ঠাকুরের কৃপায় তিনি জিতনিদ্র হয়েছিলেন। একদিন সন্ধ্যাবেলায় লাটুকে ঘুমাতে দেখে ঠাকুর তাঁকে সাবধান করে দিয়ে বলেছিলেন, "ও কিরে! এই ভর সন্ধ্যাবেলায় ঘুম কিরে? ... সন্ধ্যার সময় কোথায় ভগবানকে ডাকবি, তা না শুয়ে শুয়ে ঘুমোচ্ছিস।" অপ্রস্তুত লাটু প্রতিজ্ঞা করেছিলেন সন্ধ্যাবেলায় আর কখনই ঘুমাবেন না। সে প্রতিজ্ঞা তিনি চিরজীবন পালন করেছিলেন। কঠিন নিউমোনিয়া রোগের সময়েও তিনি চিকিৎসকের নিষেধ অগ্রাহ্য করেও বিছানায় উঠে বসতেন। একদিন রাত্রির প্রথম প্রহরে লাটুকে ঘুমিয়ে থাকতে দেখে ঠাকুর তাঁকে তিরস্কার করেছিলেন। সেই থেকে লাটু মহারাজ সারা রাত্রি ধ্যান ধারণায় কাটাতেন, শুধু দিনেরবেলায় কিছু সময় বিশ্রাম করতেন।

লাটু সরল ছিলেন। নিজের সব দুর্বলতার কথা ঠাকুরকে অকপটে খুলে বলতেন। জৈব সংস্কারের প্রভাবে মনে আসক্তির আগুন জ্বলে ওঠে। ঠাকুর তাঁকে

নাম আশ্রয় করে থাকতে বলেন। ঠাকুরের উপদেশ মতো চলে অচিরেই তিনি আসক্তি জয় করেছিলেন।

একদিন ব্রাহ্ম মুহূর্তে ঠাকুর ধ্যানরত লাটুর কুলকুন্ডলিনী জাগিয়ে দেন। ঠাকুর গাইতে থাকেন "জাগ মা কুলকুন্ডলিনী" ইত্যাদি। লাটু হঠাৎ 'উহু' চিৎকার করে উঠলেন। ঠাকুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কাঁধ চেপে ধরেন। লাটুর আসনে বসে থাকাই কঠিন হয়ে উঠেছিল। শেষ পর্যন্ত ঠাকুরের কৃপায় লাটু বাহ্যজ্ঞান শূন্য অবস্থায় উপবিষ্ট থাকেন। ঠাকুর অবশ্য অনেকক্ষণ ধরে গানটি গাইতে থাকেন।

একদিন লাটু শিবমন্দিরে ধ্যান করতে বসে গভীর সমাধিতে নিমগ্ন হন। বেলা গড়িয়ে যায় তথাপি লাটুর ধ্যান ভাঙ্গে না দেখে ঠাকুর নিজে এসে পাখা দিয়ে বাতাস করতে করতে তাঁর সমাধি ভাঙ্গান। সমাধি থেকে ব্যুত্থিত লাটু ঠাকুরকে জানান যে শিবের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে রাখতে তাঁর সামনে একটি জ্যোতির আবির্ভাব হয়। সেই জ্যোতিতে সমস্ত ঘর পূর্ণ হয়ে ওঠে। তারপর তাঁর চেতনা লুপ্ত হয়। একথা শুনে ঠাকুর বলেছিলেন, "বেশ, বেশ, এরকম আরও কত দেখবি।"

আর একদিন লাটু ধ্যান করতে করতে মাটিতে মুখ গুঁজে গোঁ গোঁ করতে থাকেন। ঠাকুর এসে তাঁকে চিৎ করে শুইয়ে বুক ডলে দিলে তিনি সহজ অবস্থা প্রাপ্ত হন। তখন ঠাকুর তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "তুই বুঝি আজ মা কালীকে দেখেছিস?"

একদিন লাটু বেলতলা থেকে ধ্যান সেরে ফিরলে ঠাকুর বলেছিলেন, আজ লেটোর পুনর্জন্ম হয়েছে।" বস্তুত লাটুর ধ্যান প্রবণতা আরও বৃদ্ধি পায়। সারারাত্রি তো তিনি ধ্যান ধারণাতে কাটাতেনই। দিনের বেলায়ও তার প্রভাব থাকতো। এই অবস্থা দেখে ঠাকুর মন্তব্য করেছিলেন, লেটো চড়েই আছে –ক্রমে লীন হবার জো!"

কাশীপুরে ঠাকুরের মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে লাটুর একদিন পরমপ্রাপ্তি ঘটেছিল। হঠাৎ হাত থেমে গেল, দেহ স্থির, চোখ পলকহীন। ডাকাডাকিতেও তাঁর বাহ্য চেতনা এলো না। অনেকদিন পরে লাটু মহারাজ এই ঘটনা নিজ মুখে বর্ণনা করে বলেছিলেন, "একদিন তো কাশীপুরে ওনার মাথায় হাত বুলুচ্ছিলুম।

তখন আমার সামনে সেই মুল্লুক খুলে গেল। সেই মুল্লুকে যা দেখেছি তা চোখ ধরতে পারেনি, যা আস্বাদন করেছি, তা জিভ নিতে পারেনি।"

ধীরে ধীরে ঠাকুরের কৃপায় তাঁর প্রিয় লেটো একজন অসাধারণ মহাপুরুষে পরিণত হন। তিনি যেন ভিন্ন জগতের মানুষ। এ জগতের কারো সঙ্গে তাঁর লেনাদেনা নেই, কোন বিষয়ে রাগদ্বেষ নেই, কোন বস্তুতে আসক্তির লেশমাত্র নেই। তাঁর এই অবস্থা দেখে গিরিশচন্দ্র ঘোষ বলেছিলেন, "গীতার সাধু দেখতে চাও তো লাটুকে দেখগে।"

স্বামী তুরীয়ানন্দ

হরিনাথ চট্টোপাধ্যায় (স্বামী তুরীয়ানন্দ) যখন প্রথম ঠাকুরের সান্নিধ্যে আসেন তখন তিনি অদ্বৈত বিচারে নিরত ছিলেন। ঠাকুর তাঁকে সেই শুষ্ক জ্ঞানপথ থেকে সরস জ্ঞান মিশ্র ভক্তিপথে টেনে এনেছিলেন। বেদান্ত চর্চায় হরিনাথ এতই বিভোর ছিলেন যে দীর্ঘদিন দক্ষিণেশ্বরে যাওয়ারও তাঁর সময় হয়নি। ঠাকুর কিন্তু তাঁকে ভোলেননি। একদিন হরিনাথের এক বন্ধুকে দেখতে পেয়ে ঠাকুর তাঁকে হরিনাথের খোঁজ খবর জিজ্ঞাসা করেন। ঐ বন্ধু ঠাকুরকে বলেন, "সে মশাই আজকাল খুব বেদান্ত চর্চায় মন দিয়েছে। রাতদিন পাঠ্য বিচার -তর্ক নিয়ে আছে। তাই বোধহয় সময় নষ্ট হবে বলে আসেনি।" এর কিছুদিন পরে হরিনাথ দক্ষিণেশ্বরে গেলে ঠাকুর তাঁকে বলেন, "কিগো, তুমি নাকি আজকাল খুব বেদান্ত বিচার করছ? তা বেশ বেশ! তা বিচার তো খালি এই গো– ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, না আর কিছু?" এতদিন হরিনাথের ধারণা ছিল উপনিষদ, পঞ্চদশী প্রভৃতি বই না পড়লে এবং সাংখ্যন্যায়াদি দর্শনে বুৎপত্তি না হলে বেদান্ত বোঝা যায় না। ঠাকুরের কথাগুলি শুনে তাঁর কাছে বেদান্তের মর্ম উদ্ঘাটিত হয়ে গেল। তিনি বুঝলেন ঠাকুরের ঐ কয়টি কথা ধারণা করতে পারলে বেদান্তের সার বোঝা যায়। ঠাকুরের কৃপায় হরিনাথ সঠিক পথের সন্ধান পেলেন। জ্ঞান-বিচারের শুষ্ক পথের পরিবর্তে ঈশ্বর লাভের লক্ষ্যে সাধনভজনে মনোনিবেশ করলেন।

একদিন বলরাম বসুর বাড়িতে ঠাকুর উপদেশ দিচ্ছিলেন-'কি জান, কাম-কাঞ্চনকে ঠিক ঠিক মিথ্যা বলে বোধ হওয়া, জগৎটা তিন কালেই অসৎ বলে ঠিক ঠিক মনে-জ্ঞানে ধারণা হওয়া কি কম কথা! তাঁর দয়া না হলে কি

হয়? তিনি কৃপা করে ঐরূপ ধারণা করিয়ে দেন তো হয়। নইলে মানুষ নিজে সাধন করে সেটা কি ধারণা করতে পারে?' ঈশ্বরের দয়ার কথা বলতে বলতে ঠাকুরের সমাধি হয়। সমাধি ভঙ্গের পর গাইতে থাকেন–

ওরে কুশীলব করিস কি গৌরব
ধরা না দিলে কি পারিস ধরিতে!

গাইতে গাইতে ঠাকুরের চোখ দিয়ে অশ্রুধারা নামল। ঠাকুরের উপদেশ শুনে ও দেখে হরিনাথের ঠিক ঠিক ধারণা হয়ে গেল, ঈশ্বরের কৃপা ভিন্ন কিছুই হবার নয়।

হরিনাথ একদিন ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "আচ্ছা, কামটা একেবারে যায় কি করে?" উত্তরে ঠাকুর বলেছিলেন, "যাবে কেন রে? মোড় ফিরিয়ে দেনা।" ঠাকুরের উপদেশ মত চলে হরিনাথ সুফল পেলেন। মেয়েদের অবজ্ঞার চোখে না দেখে তাদের মায়ের মতো দেখতেও ঠাকুর তাঁকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। ঠাকুর হরিনাথকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন– তাদের যতই অবজ্ঞা করবি ততই তাদের ফাঁদে পড়বি। সাধন পথে এইসব অমূল্য উপদেশের ফলেই হরিনাথ রিপুজয়ী এক দিব্যপুরুষে পরিণত হয়েছিলেন।

হরিনাথ ঠাকুরকে অবতার বলে জেনেছিলেন। কাশীপুরে ঠাকুর যখন গলরোগে শয্যাশয়ী তখন হরিনাথ একদিন এসে জিজ্ঞাসা করেন "কেমন আছেন?" ঠাকুর বললেন, "বড় কষ্ট হচ্ছে, খেতে পাচ্ছি না, অসহ্য জ্বালা যন্ত্রণা হচ্ছে।" হরিনাথ কিন্তু দিব্য চক্ষে দেখলেন ঠাকুর আনন্দের সাগর ও রোগ যন্ত্রণার অতীত। তিনি ঠাকুরকে বলে ফেললেন, "আপনি যাই বলুন না কেন, আমি দেখছি, আপনি অসীম আনন্দের সমুদ্র।" কথাটা শুনে ঠাকুর হাসতে হাসতে বললেন, "শালা ধরে ফেলেছে রে।"

স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ

সারদা প্রসন্ন মিত্র (স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ) কথামৃতকার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের ছাত্র ছিলেন। মাষ্টার মশায়-ই তাঁকে প্রথমে ঠাকুরের কাছে নিয়ে যান। প্রথম দর্শনেই ঠাকুর বুঝেছিলেন সারদা উচ্চ আধার এবং তাঁর অন্তরঙ্গ। ঠাকুর তাঁকে দক্ষিণেশ্বরে আসা-যাওয়া করতে এবং প্রয়োজনে নহবতে বাসরতা শ্রীশ্রীমায়ের কাছ থেকে গাড়ী ভাড়ার পয়সা নিতে বললেন। যে

দু'একজন ভক্ত সন্তানকে ঠাকুর শ্রীশ্রীমায়ের কাছ থেকে দীক্ষার নির্দেশ দিয়েছিলেন সারদা প্রসন্ন তাঁদের অন্যতম। সারদা প্রসন্নের অনুপম মাতৃভক্তির দৃষ্টান্তও রামকৃষ্ণ ভক্ত মণ্ডলীর ইতিহাসে ভাস্বর হয়ে আছে। একটি মাত্র দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে ঠাকুরের ভক্তবাৎসল্যের প্রসঙ্গে আসব। একবার সারদা মহারাজ মাকে নিয়ে জয়রামবাটী যাচ্ছিলেন। মা ছিলেন গোরুর গাড়িতে আর সারদা মহারাজ চলেছিলেন পায়ে হেঁটে। রাতেও গাড়ি চলছিল। হঠাৎ দেখা গেল রাস্তার এক জায়গায় প্রকাণ্ড গর্ত। গর্তের উপর দিয়ে গাড়ি চালালে গাড়ি উল্টে যেতে পারে। তাছাড়া মা তখন ঘুমিয়েছিলেন, ঝাঁকানিতে মার ঘুমও ভেঙ্গে যাবে। বীরভক্ত সারদা প্রসন্ন গর্তের মধ্যে শুয়ে তাঁর পিঠের উপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে যাবার নির্দেশ দেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য এই নির্দেশ পালনের দরকার হয়নি। কথাবার্তায় মায়ের ঘুম ভেঙ্গে যাওয়ায় তিনি গাড়ি থেকে নেমে আসেন এবং সারদা প্রসন্নকে তাঁর পাগলামির জন্যে তিরস্কার করেন।

সারদা প্রসন্ন বিত্তশালী পরিবারের সন্তান ছিলেন। বাড়ীতে দাসদাসীর অভাব ছিল না। ফলে তাঁর ধারণা ছিল সেবার কাজ কেবলমাত্র দাসদাসীরই করণীয়। সর্বজ্ঞ ঠাকুর তাঁর প্রিয় সন্তানের এই ভুল ধারণা সযত্নে নিরসন করেন। একদিন সারদা দক্ষিণেশ্বরে এলে ঠাকুর তাঁকে আদেশ করলেন, "কিছু জল এনে আমার পা ধুইয়ে দে।" একথা শুনে সারদার বিশ্বাসই হয় না যে ঠাকুর তাঁকে ঝি চাকরদের করণীয় ঐ হীন কাজ করতে বলতে পারেন। লজ্জায় তাঁর মুখ লাল হয়ে গেল। তিনি নিশ্চল হয়ে রইলেন। ঠাকুর সব বুঝেও আবার তাগাদা দিলেন, "কই, জল নিয়ে আয়।" সেদিন অনিচ্ছায় সারদা ঠাকুরের আদেশ পালন করেছিলেন। পরে ঠাকুরের স্থূল জীবনের অন্তিম পর্বে শ্যামপুকুরে এবং কাশীপুরে এই সারদাই কি গভীর ভালবাসায় ঠাকুরের সেবা করেছিলেন। শুধু তাই নয়, সেবাপরায়ণতা তাঁর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছিল। বন্ধুবান্ধব বা পরিচিত কারো অসুখ করলে তিনি শয্যাপাশে বসে অম্লান বদনে সেবা করতেন। যোগানন্দজীর শেষ অসুখের সময় রাত জেগে তাঁর সেবা করতেন। উদ্বোধনের ছাপাখানার একজন কর্মচারীর কলেরা হলে তিনি নিজের হাতে তার সেবা করে তাকে নিরাময় করেছিলেন।

দেহত্যাগ করেও ঠাকুর সারদাপ্রসন্নের উপর সস্নেহ সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। একবার একাকী পথ চলতে চলতে তিনি দৈবক্রমে বিরাট জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ

করেন। ধীরে ধীরে রাত্রি গভীর হয় এবং তিনি অন্ধকারে দিশেহারা হয়ে পড়েন। ঠাকুরকে স্মরণ করা ছাড়া তাঁর আর কোন পথ ছিল না। একটি গাছে বসে তিনি ঠাকুরকে স্মরণ করতে লাগলেন। ঠাকুরের কি কৃপা! একজন এসে তাঁকে বাতাসা ও জল দিয়ে গেল। তখন তাঁর ধারণা হয় সামনেই বুঝি লোকালয় আছে। কিন্তু সকালে সেই বন তন্ন তন্ন করে খুঁজেও সেই উপকারী ব্যক্তি বা কোন লোকালয়ের সন্ধান পেলেন না। বুঝলেন সবই পরম কারুণিক ঠাকুরের কৃপা।

সারদা মহারাজ অসাধারণ সাহসী ছিলেন। তিনি ভূতের অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন না। একদিন শুনলেন রাত্রিতে একটি পুরানো বাড়িতে গেলে ভূত দেখা যাবে। সারদা সেই বাড়িতে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। মাঝরাত অবধি অপেক্ষা করেও তিনি কিছু দেখতে পেলেন না। হঠাৎ ঘরের কোণে একটা ক্ষীণ আলো দেখা গেল। ক্রমশঃ সেই আলো উজ্জ্বলতর হল। সারদা দেখলেন আলোর মধ্যে একটা বিশাল চোখ যেন তাঁর দিকে দ্রুত এগিয়ে আসছে। তিনি শিউরে উঠলেন এবং তাঁর সংজ্ঞা লোপের উপক্রম হল। এমন সময় ঠাকুর তাঁকে দেখা দিয়ে হাত ধরে বললেন, "বাছা, যে কাজে মৃত্যু নিশ্চিত সে-সব কাজ বোকার মত কর কেন? আমার প্রতি মন রাখলেই যথেষ্ট হবে।

সারদা মহারাজের একবার নির্জন শ্মশানে তান্ত্রিক সাধনা করার ইচ্ছা হয়। তখন তিনি অন্যান্য গুরুভাইদের সঙ্গে বরানগর মঠে বাস করছিলেন। সারদা মহারাজ নিঃশব্দে মঠ ছেড়ে বার হবেন সেই মুহূর্তে নিদ্রিত রাজা মহারাজ অকস্মাৎ চিৎকার করে বলে উঠলেন, "ওরে সারদা, যাস নি, যাস নি।" সারদা মহারাজের আর যাওয়া হল না। রাজামহারাজ কেন ঘুমের মধ্যে ঐরকম চিৎকার করে উঠেছিলেন গুরুভাইরা সে কথা জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেছিলেন ঠাকুর স্বপ্নে ঐভাবে সারদা মহারাজকে নিষেধ করতেও বলেছিলেন। এরপর সারদা মহারাজ আর তন্ত্র সাধনার চেষ্টা করেননি।

সেবাধর্মেই স্বর্গীয়সুখ প্রাপ্তি সম্ভব **শ্রীচিত্তরঞ্জন পাত্র**

বহুবর্ষ পূর্বে এক ব্যক্তি ধনী ব্যক্তিদের অঞ্চলে একটি বিরাট বাড়ী ভাড়ায় নিয়ে বসবাস করছিলেন। তিনি খুবই ধনী ব্যক্তি ছিলেন কিন্তু অর্থব্যয় করে নিজস্ব বাড়ী কেনার পিছনে ব্যয় না করে চাকর, ঠাকুর এবং আরও কিছু সদস্য নিয়ে ধূমধামে বসবাস করছিলেন। তবে ভদ্রলোক খুবই অহংকারী এবং নিজের আভিজাত্য রক্ষার জন্য কাউকে সম্মান করতে ইচ্ছুক ছিলেন না। শুধু নিজের সুখ সুবিধার কথাই সকল সময়ে মনে ধরে রাখতেন, অন্যদের হেয় করে চলতেন। তাঁর এরূপ ব্যবহারের জন্য কেউ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন না।

একদিন একজন বিদ্বান সাধু ঐ রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন, তিনি ভিক্ষা অন্নে নিজের জীবন যাপন করতেন এবং এক নদীর তীরে ছোট্ট কুটীর তৈরী করে বসবাস করতেন। তিনি অন্য বাড়ীতে ভিক্ষা করার পর ঐ অহংকারী ধনীর বাড়ীতে ভিক্ষা করার ইচ্ছায় উপস্থিত হয়ে ভিক্ষা চাইলেন। ঐ অহংকারী ভদ্রলোক তাঁকে ভিক্ষা তো দিলেনই না উপরন্তু বেশ কিছু নিন্দনীয় কথা শুনিয়ে দিলেন। তখন ঐ সাধু মহারাজ তাঁর ব্যবহারে ক্ষুব্ধ না হয়ে তাঁকে বললেন, দেখ তুমি যেই হও না কেন আমি জানি তুমি এই বাড়ীর মালিক নও। তুমি একজন সামান্য ভাড়াটে মাত্র, তাই এই বাড়ী নিয়ে তোমার অহংকার সাজে না। তুমি বেশ কিছু অর্থের মালিক হয়ে নিজেকে রাজা বা মহারাজা মনে করে এতো বেশী অহংকারী হয়ে উঠেছ। এতো উঁচুতে উঠার তোমার যোগ্যতা নেই বরং ধুলার ধরনীতে নেমে এসো। বাস্তব এই যে, তোমার কিছুই নেই, কিন্তু এমন ব্যবহার করছো যেন সব কিছুই তোমার বশীভূত। অবশ্য এমন মনোভাব অনেকেরই মধ্যে বিদ্যমান। তাই দশ ও দেশের এমন শোচনীয় অবস্থা। প্রকৃত অবস্থা এইটুকুই জেনো, কোন কিছুই আমার বা আমাদের নয়, সবকিছুই পরমাত্মার অধীন, তাই তিনি আমাদের যতটুকু উপহার স্বরূপ প্রদান করেছেন তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকো। অধিক লোভ বা মোহ ভালো নয়। আরও জেনো, অধিক বিদ্যা বুদ্ধি অর্জন করেও অনেকেই জ্ঞান সমুদ্রের উপকূলে কাকের মতো 'কা' 'কা' করে বেড়ায়। যার জীবনের সাথে বাস্তবের তালমেল নেই সে কখনো উপলব্ধিই করতে পারে না কিভাবে জীবন ব্যতীত করা যায়। তুমি 'মায়া জগতে' দিক ভুল করে অহংকারে মত্ত হয়েছ, সবকিছু ভুলে যাচ্ছ, কিন্তু যখন তোমার মনে নানা রূপ প্রশ্ন জাগবে তখন দেখবে সব অন্ধকার। কোথাও আলো নেই। যদি আধ্যাত্মিক পথ ধরে এগিয়ে যেতে পারো তবে বাসনা এবং

অহংকারকে সংযত করতে পারবে তখনই মন পবিত্র হবে এবং জীবনে শান্তি পাবে। হিন্দুধর্মে সঠিক পথে যাবার জন্য অনেকে পথ দেখিয়েছেন। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, 'যত মত তত পথ', তাই একটি সঠিক পথ খুঁজে নেবার জন্য অনেক ইঞ্জিনীয়ার, ডাক্তার, লেখক এবং বিদ্বান ব্যক্তিরা বিভিন্ন আশ্রমে গিয়ে বাস করে নিজেদের সাধন পথ খুঁজে নেন। পূর্বে আমাদের মুনি ঋষিরা রাজা মহারাজারা এবং সাধারণ জনসাধারণ গৃহস্থ ধর্ম পালন করার পর বানপ্রস্থ নিতেন কারণ ঐ সময়ে বনে জঙ্গলে গুরুর আশ্রমে সকলের জন্য কাজ করে এবং ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে জীবন অতিবাহিত করে তৃপ্ত হতেন এবং শান্তিতে শেষ জীবন সুসম্পন্ন করতেন।

এই সমস্ত আশ্রমবাসীগণ সেবা দিয়ে, কর্ম দিয়ে সকলের জন্য নিজেদের নিয়োজিত রেখে গুরু-শিষ্য এবং জনসেবার মধ্যে একটি নিঃস্বার্থ বন্ধনে বাঁধা পড়ে যেতেন। যদিও পূর্বে কম বয়সেই অনেকে গুরুগৃহে এসে সেবা কার্য করে, অধ্যয়ন করে দিন যাপন করে খুশী থাকতেন। এই প্রসঙ্গে আরুণির কথা বলা যাতে পারে। অহংকার ত্যাগ করে কর্ম-ধর্ম স্বর্গসুখ এনে দেয়।

ঐ অহংকারী ধনী ব্যক্তি সাধু মহারাজের অসাধারণ যুক্তিপূর্ণ কথাবার্তায় মোহিত হয়ে পরমার্থে জীবন-যাপনের সংকল্প নিয়ে সাধু মহারাজের শিষ্যত্ব নিয়ে স্বর্গসুখ উপলব্ধি করতে থাকলেন।

"ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী
কমলা কমল-দলবিহারিণী
বাণী বিদ্যাদায়িনী
নমামি ত্বাং
নমামি কমলাম্
অমলাং অতুলাম্
সুজলাং সুফলাং
মাতরম্
বন্দে মাতরম্।"

-- শ্রী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

DO NOT COPY

পিতা নো বোধি **সুনন্দন ঘোষ**

শরীরে যখন ছিলে, পিতা ছিলে একান্ত আমার –
নশ্বর দেহের ধোঁয়া চলে গেল ঊর্দ্ধে মহাকাশে
শেষ হোল স্পর্শের আশ্বাস,
আজ তুমি বিশ্বপিতা অন্তহীন সৃষ্টির আধার।

গিরি মরু হিমবাহ অনন্ত জলধি,
তোমার প্রকাশ সবই, তোমার বিকাশ নিরবধি।
দূর নীহারিকা থেকে বল্মীকের স্তূপ
তোমারই বিকীর্ণ সত্তা, আনন্দ স্বরূপ।

পিতা হয়ে আছো তুমি ভূলোকে দ্যুলোকে –
"দ্বৈত নাস্তি নহিনা নাস্তি কিঞ্চন" –
আত্মার আধান তুমি সত্য অবিনাশী,
তৃষ্ণা-ক্লিষ্ট নিদাঘের শান্তি বরিষণ।

শরীর টেনেছে গণ্ডী তোমার আমার মাঝে,
এনেছে বিভেদ;
তোমার চরণ তলে নত আমি পিতা
মুছে দাও ক্লেদ।

DO NOT COPY